পশ্চিমবঙ্গ আমাদের দেশের একটি ছোট রাজ্য। এটি আজকের তুলনায় অনেক বড় ছিল। ভারত স্বাধীন হলে বাংলা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। রাজ্যের পূর্ব অংশ পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয় এবং এখন এটি বাংলাদেশ নামে পরিচিত। বাংলার যে অংশটি ভারতের অংশ তা পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর সীমানা ভুটান ও সিকিম ছুঁয়েছে। উত্তরের অংশ হিমালয়ে অবস্থিত। এটিতে বেশ কয়েকটি পাহাড় এবং সরু উপত্যকা রয়েছে। এই পাহাড় ও উপত্যকাগুলো বনে ঢাকা। সমুদ্রের কাছে রাজ্যের দক্ষিণ অংশটি ব-দ্বীপ অঞ্চল নামে পরিচিত। এই এলাকায় নদী ও হ্রদের ছোট ছোট উপনদী রয়েছে। এই এলাকার বেশির ভাগ জমি জলাভূমি। ব-দ্বীপ অঞ্চলের কিছু অংশ সুন্দরবন নামে পরিচিত একটি ঘন বন দ্বারা আচ্ছাদিত। পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্ট অঞ্চলটি অনেক নদী এবং ট্যাঙ্ক সহ একটি নিচু সমভূমি।) ট্যাঙ্ক।) প্রায় প্রতিটি গ্রাম বা শহর একটি নদী বা ট্যাঙ্কের তীরে অবস্থিত। গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলি হল গঙ্গা, হুগলি এবং দামোদর। এসব নদী জমিকে অনেক উর্বর করে তুলেছে প্রধান ফসল ধান ও পাট। আখ, তামাক ও ডালও জন্মে। অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। তাদের জীবন খুব সহজ হলে। এদের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ। রাজ্যে অনেক শিল্প রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তুলা, পাট এবং কাগজের মিলগুলি সুপরিচিত। দুর্গাপুরে একটি ইস্পাত কারখানা আছে। পশ্চিমবঙ্গ তার হস্তশিল্পের জন্যও পরিচিত। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ বাঙালি হস্তশিল্পের প্রতি অনুরাগী।
পশ্চিমবঙ্গ "একটি সমস্যা রাজ্য" হিসাবে একটি বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের ফলস্বরূপ জটিলতা সহ সমগ্র ভারত যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গে একাধিক ঐতিহাসিক কারণ ও ঘটনা দ্বারা জটিল হয়েছে যা উপ-মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলকে প্রভাবিত করেনি, বা অন্তত করতে পারেনি। একই ডিগ্রী। মাত্র 87,800 বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা 54,486,000 জন এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 600 জন মানুষের ঘনত্ব রয়েছে, যা শুধুমাত্র কেরালা ছাড়া রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে রাজধানী শহর কলকাতায় জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ঘনত্ব রয়েছে এবং এর কিছু এলাকা বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত।
সম্প্রদায় অনুসারে, জনসংখ্যার প্রায় 77.7 শতাংশ হিন্দু এবং 20 শতাংশের বেশি মুসলিম। এটি পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যালঘু রাজ্যে পরিণত করে - প্রথমটি হল উত্তর প্রদেশ। জনসংখ্যার প্রায় 20 শতাংশ তপশিলি জাতি এবং প্রায় 6 শতাংশ তফসিলি উপজাতি নিয়ে গঠিত। একসময় সাক্ষরতার সর্বোচ্চ হার ছিল, পশ্চিমবঙ্গে এখন (1981 সালের আদমশুমারি অনুসারে) মাত্র 40 শতাংশ (50.5 শতাংশ পুরুষ এবং 30.3 শতাংশ মহিলা) সাক্ষর রয়েছে৷ তবে, সাংস্কৃতিকভাবে, বাংলার সবসময়ই নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট পরিচয় ছিল এবং আছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি:

30 শতাংশ শহুরে জনসংখ্যা সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম এবং আরও নগরীকৃত রাজ্যগুলির মধ্যে একটি, পশ্চিমবঙ্গের একটি উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক চেতনার ঐতিহ্য রয়েছে যেখানে অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ শতাংশ যুবক এবং তাদের মধ্যে শিক্ষিত বেকার রয়েছে। . সাধারণভাবে বাঙালিরা আবেগপ্রবণ জাতি হিসেবে পরিচিত নীরবে কষ্ট সহ্য করে না, ক্রোধের সহিংস বিস্ফোরণে।
অনেক বাঙালি এখনও গোপাল কৃষ্ণ গোখলের বিখ্যাত মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে: "বাংলা আজ যা ভাবছে, ভারত আগামীকাল ভাবছে।" কিন্তু তারা এখন কম এবং কম প্রত্যয়ের সাথে এটি করে। বাংলা একসময় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, কিন্তু এখন তা পিছনে রয়েছে। প্রায় দুই দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এই বাস্তবতার দর্পণ হয়ে আছে। এটা হয়েছে পতনের রাজনীতি। এটি 1967 সাল থেকে রাজ্যের সমস্ত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে। এটি পশ্চিমবঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এর উত্থানের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। সিপিআই(এম), অন্য যেকোনো দলের চেয়ে বেশি, বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব করে, বিশেষ করে বাঙালি ভদ্রলোকের পতনের প্রতি বিরক্তি এবং তাদের বেশিরভাগ মনোভাব প্রতিফলিত করে।
গল্পটি বাংলার ঊর্ধ্বগতির বছরগুলি দিয়ে শুরু করতে হবে এবং সেই ভদ্রলোকের পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যারা শুরু থেকেই বাংলার রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে। এর সমস্ত দৃঢ় নেতারা তাদের পদ থেকে এসেছেন, পরবর্তী পরিসংখ্যানগুলিও তাই করেছিল। সিপিআই(এম), প্রায় সব স্তরেই এর নেতৃত্ব প্রধানত ভদ্রলোক। জে.এইচ. ব্রুমফিল্ড ভদ্রলোককে "ভদ্রলোক, সামাজিকভাবে

সুবিধাপ্রাপ্ত এবং সচেতনভাবে উচ্চতর গোষ্ঠী, জমি ভাড়া এবং পেশাগত ও কেরানির চাকরির উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তারা একটি প্রভাবশালী অভিজাত ছিল এবং একটি শ্রেণী নয় এবং তাদের ভাঁজের মধ্যে ধনী থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আন্তঃবিভাগ অন্তর্ভুক্ত ছিল, সাধারণ বন্ধন তাদের শিক্ষা এবং উচ্চ মর্যাদার গর্ব। বেশিরভাগ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিয়ে গঠিত, তারা বাংলায় ব্রিটিশ দখলদারিত্বের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে তাদের উত্থানের জন্য দায়ী। তারা আমলাতন্ত্র এবং আইন, চিকিৎসা ও শিক্ষকতা পেশায় সুযোগের সবচেয়ে বেশি সদ্ব্যবহার করেছিল যা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে প্রসারিত হয়েছিল।

ভদ্রলোকের অনুভূমিক বিস্তার, ব্যাপকভাবে, "বাঙালি রেনেসাঁ" নামে পরিচিত অসাধারণ সৃজনশীলতার সাথে মিলে যায় যা তারা নেতৃত্ব দিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। এই সময়কালে শুধুমাত্র বেশ কয়েকজন অদম্য নেতার উত্থান ঘটেনি বরং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের উত্থানও দেখা যায়, প্রধানত 1905 সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের একটি অংশ হিসেবে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বীরদের একটি প্যান্থিয়ন তৈরি করেছিল যাদের সাহসী আত্মত্যাগের কাজ। গভীর প্রশংসা জাগিয়েছে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন যা বিশেষত ভদ্রলোককে পঙ্গু করার লক্ষ্যে ছিল, যাকে ব্রিটিশরা হুমকি হিসাবে উপলব্ধি করতে এসেছিল, তারও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ রদ সম্ভবত বাঙালিদের সেরা সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু এটাই ছিল তাদের শেষ জয়। এখন তাদের পতনের মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। অনেকাংশে, তাদের পতন ছিল তাদের সংকীর্ণ অর্থনৈতিক ভিত্তির ফল। তাদের মধ্যে খুব কমই ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের কাজে গিয়েছিল। তবে জমি থেকে আয় কমতে শুরু করে কারণ আদিম কোনো কিছুর অনুপস্থিতির কারণে হোল্ডিংগুলি খণ্ডিত হয়। আমলাতন্ত্রে চাকরির সম্প্রসারণ চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি কারণ স্নাতকের সংখ্যা বেড়েছে। শিক্ষা অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ায় বাংলার বাইরের সুযোগগুলো সঙ্কুচিত হতে থাকে। বাংলার মুসলমানদের একটি বড় অংশ দেশভাগকে সমর্থন করেছিল যা ব্রিটিশরা তাদের সুবিধার জন্য এবং ভদ্রলোককে আকারে ছোট করার একটি পদক্ষেপ হিসাবে প্রজেক্ট করেছিল। ভদ্রলোক প্রতিটি ফ্রন্টে ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে ছিল। তাদের যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব অভূতপূর্ব মাত্রায় বেড়েছে। শতাব্দীর শুরু থেকে মূল্যবৃদ্ধির কারণে তাদের জীবনযাত্রার মান তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাংলা, যার সমৃদ্ধি এক সময় ছিল উপশব্দ, অবিরাম ব্রিটিশ লুণ্ঠনের দ্বারা দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। এর দুর্দশা 1943 সালের দুর্ভিক্ষ দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে আন্ডারলাইন করা হয়েছিল, যা সরকারী অনুমান অনুসারে 150,000 প্রাণ দিয়েছে। তাই ভদ্রলোক স্বাধীনতার আগে থেকেই বোধহয় তিক্ত বিরক্তির মেজাজে ছিল। তাদের বেশিরভাগ ক্ষোভ কংগ্রেস এবং গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, উভয়কেই তাদের নিজেদের পতনের পাশাপাশি বাংলার পতনের জন্য দায়ী করা হয়েছিল।

প্রথম কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন বাঙালি। মডারেটদের নেতাদের মধ্যেও বাঙালিরা বিশিষ্ট ছিলেন যারা কংগ্রেসের শিশু পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনেও তারা ছিলেন সম্মুখভাগে। 1917 সালের রুশ বিপ্লবের পর ভারতে উদ্ভূত বেশিরভাগ মার্কসবাদী-বাম দলগুলির মতোই সফল প্রাথমিক সন্ত্রাসী সংগঠন- যুগান্তর এবং অনুশীলন সমিতি বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম দিকে বাংলার প্রাধান্য, এবং পরবর্তীকালে গান্ধীর আবির্ভাবের সাথে এর পতন, বাঙালি রাজনীতির বোঝার কেন্দ্রবিন্দুতে নিহিত। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো নয়, বাংলার কংগ্রেস পার্টি স্বাধীনতার পর পর্যন্ত গান্ধী এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্টি সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি, যা ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির উপর গভীর প্রভাব ফেলবে। বাংলার বেশ কিছু মানুষ ও গোষ্ঠী, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, এমনকি 1920-এর দশকেও গান্ধীকে গ্রহণ করেছিল। যাইহোক, গান্ধীর জীবনের বেশিরভাগ সময়ে বাংলায় কংগ্রেস পার্টির আধিপত্য বিস্তারকারী পশ্চিমা শহুরে বুদ্ধিজীবীরা, যেমন চিত্তরঞ্জন দাস 1925 সালে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এবং তারপরে সুভাষ বোস এবং তাঁর অনুগামীরা প্রায় অবিরাম কংগ্রেসের সক্রিয় বিরোধিতায় ছিলেন। গান্ধী-শাসিত কেন্দ্র এবং বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে বিদ্বেষ বিভিন্ন কারণের কারণে ছিল। এটি আংশিকভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির উপর একটি সংগ্রামের ফলাফল ছিল। অহিংসা এবং আলোচনায় গান্ধীর বিশ্বাস বাঙালির বিশ্বাসের সাথে তীব্রভাবে বিপরীত ছিল যে সন্ত্রাস ও সহিংসতা 1905 সালের দেশভাগ প্রত্যাহার করতে এবং ব্রিটিশদের কাছ থেকে অন্যান্য ছাড় পেতে সফল হয়েছিল। অধিকন্তু, বাঙালি মধ্যবিত্ত (কলকাতার পশ্চিমীকৃত শহুরে বুদ্ধিজীবীরা) গান্ধীর ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং

আচরণের পদ্ধতিগুলিকে ঘৃণার চোখে দেখার প্রবণতা দেখায় এবং তার তপস্বীতা, গোহত্যার প্রতি তার বিরোধিতা, হাত ঘোরানোর ওকালতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তার যন্ত্রের বিরোধিতা। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শহুরে মধ্যবিত্তের সমস্যাগুলির প্রতি গান্ধীর সামান্য অনুভূতির কারণে এটি হতে পারে। তার প্রধান উদ্বেগ ছিল গ্রামীণ এলাকা নিয়ে, এবং তার মনোযোগ ছিল প্রাথমিকভাবে কর্মসূচীর উপর, যেমন স্পিনিং, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য, যা শিক্ষার সম্প্রসারণ নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন একটি শ্রেণিকে সামান্য সন্তুষ্টি প্রদান করে। এবং পেশাদার এবং সরকারি চাকরির জন্য আরও বেশি সুযোগ।

বাঙালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্টির সাথে গান্ধীবাদী নেতৃত্বের বৈরিতা স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। 1923 সালে সি আর দাস কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। 1928 এবং 1929 উভয় কংগ্রেস অধিবেশনে, তার উত্তরসূরি, সুভাষ বোস, গান্ধীর সাথে তার মতপার্থক্য প্রকাশ্যে ভোটে নিয়ে আসেন। 1939 সালে এই বিরোধ চরমে পৌঁছেছিল যখন বোস গান্ধীর নিজের প্রার্থীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভাপতি পদের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। যাইহোক, গান্ধীর সহযোগিতার অভাবের কারণে তিনি একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারেননি। 1939 সালে বোসের বহিষ্কার এবং 1942 সালে ভারত থেকে তার ফ্লাইট এবং 1947 সালের বিভাজন কার্যত শহুরে জোটকে ধ্বংস করে দেয় যেটি 1920 সাল থেকে বাংলায় কংগ্রেস সংগঠনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বেশ কিছু কংগ্রেস সমর্থক বোসকে অনুসরণ করে বামপন্থী দলগুলিতে যোগ দিয়েছিল।"

নির্বাচনী রাজনীতি এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন:

স্বাধীনতা পশ্চিমবঙ্গে একটি গুরুতর রাজনৈতিক সংকটের সূচনা করে। 1939 সালে সুভাষ বসুকে বহিষ্কারের আগ পর্যন্ত যে শহুরে জোট কংগ্রেসের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তার আর অস্তিত্ব ছিল না। বিভাজনের দ্বারা কংগ্রেসের বেশ কয়েকটি দুর্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পার্টি এমন একটি এলাকায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়েছিল যেখানে স্বাধীনতার আগে একটি মুসলিম মন্ত্রণালয় ক্ষমতায় ছিল। বিধানসভা বা বেঙ্গল পিসিসি-র নিয়ন্ত্রণে কোনো একক গোষ্ঠী না থাকায়, কংগ্রেস হাইকমান্ড এগিয়ে আসে এবং প্রফুল্ল ঘোষকে সমর্থন জানায়, যিনি গান্ধীবাদের প্রবল সমর্থক ছিলেন। অ্যাসেম্বলি পার্টি তাকে সমর্থন করেনি, এবং কংগ্রেস সদস্যরা শীঘ্রই একজন নতুন নেতার জন্য আন্দোলন শুরু করে, যার ফলে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। 1948 সালের জানুয়ারিতে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যরা বিধান চন্দ্র রায়কে সমর্থন করেন। জোট যা বি.সি. 1948 সালে প্রভাবিত রায় উল্লেখযোগ্যভাবে স্থিতিশীল ছিলেন।

রাজনৈতিকভাবে, অবনতিশীল পরিস্থিতি বিরোধী দলগুলি, বিশেষ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে উপকৃত করতে বাধ্য। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা এবং ব্রিটিশদের সাথে তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা, তবে এর ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন করেছিল; তাই সুভাষ বসুর উপর এর ভীতিকর আক্রমণ হয়েছিল যিনি তার ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর সাথে জাপানিদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। এছাড়াও, 1948 সালে দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে সিপিআই যে বিদ্রোহের লাইন গ্রহণ করেছিল তার ফলে এটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং পুলিশি দমন-পীড়নের ফলে এর সংগঠনটি ভেঙে যায়। 1951 সালে CPI এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছিল যখন এটি তার বিদ্রোহমূলক ভূমিকা পরিত্যাগ করেছিল।

প্রাক-1967 সময়কাল:

1948 সালের জানুয়ারিতে, (ডা. পি.সি. ঘোষ গান্ধীর আশীর্বাদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। এটি পশ্চিম-বঙ্গের রাজনীতি থেকে গান্ধী গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতার 2 সূচনা করে। নেহেরু এবং সর্দার প্যাটেলের সাথে রায়ের বিশেষ ব্যক্তিগত সমীকরণ এবং সমর্থন। তিনি আরামবাগ-তমলুক জোট থেকে তার অবস্থানকে শক্তিশালী করেছিলেন কিন্তু একজন চিকিৎসক হিসেবে রায়ের খ্যাতি তাকে এমন একটি কর্তৃত্ব দেয় যা কংগ্রেস পার্টির সংগঠনের চালিকাশক্তি ছিল অতুল্য ঘোষ, যাকে তার নিজের মত করে রাজ্য পরিচালনার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। , সাধারণত মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থনে। কংগ্রেস 1952 সালের নির্বাচনে স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবধানে জয়লাভ করে এবং প্রধানত জমিদারদের দ্বারা সংগ্রহ করা গ্রামীণ ভোটের সাহায্যে এবং গ্রামীণ ধনীরা যারা স্থিতিশীলতা চেয়েছিল, যা তারা মনে করেছিল যে কংগ্রেস দ্বারা নিশ্চিত করা যেতে পারে। কিন্তু বোধগম্যভাবে, অন্যান্য বিরোধী দলগুলির মতো, এটি 1952 সালের বিধানসভা এবং সংসদীয় নির্বাচনে ভাল করতে পারেনি। সমাজতন্ত্রীরা, যারা সবেমাত্র কংগ্রেস থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, তারা খুব অসংগঠিত ছিল এবং তাদের কাছে সামান্য অর্থ ছিল। যদিও কমিউনিস্ট-অধ্যুষিত বামপন্থী ফ্রন্ট (যার মধ্যে সিপিআই, বিপ্লবী সোশ্যালিস্ট পার্টি, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি এবং বলশেভিক পার্টি রয়েছে) 42টি আসন জিতেছে এবং বিধানসভার জন্য 27.5 শতাংশ ভোট পেয়েছে, তবে অভাবটি বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্যের ফলে প্রায় প্রতিটি আসনেই বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে।

অতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে, কংগ্রেস ধীরে ধীরে একটি সংগঠন গড়ে তোলে, প্রধানত গ্রামীণ এলাকায় ধনী কৃষক এবং জমিদারদের দ্বারা সমর্থিত। ভদ্রলোক অবশ্য এর প্রতি বিরূপ ছিল। কিন্তু তারা ছিল একটি শহর-ভিত্তিক প্রান্তর, গ্রামীণ এলাকার মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন, সাধারণ ধর্মঘট এবং শহরের সহিংসতা সংগঠিত করতে সক্ষম কিন্তু এখনও গণভোটের প্রভাব ফেলতে পারেনি। এইভাবে, 1957 সালের সাধারণ নির্বাচনে পাঁচ-দলীয় জোট থাকা সত্ত্বেও, কংগ্রেস স্বাচ্ছন্দ্যে জিতেছিল। 1957 সালে বামপন্থী ফ্রন্ট মূলত পিএসপি যোগ করার সাথে একই গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত, এবং এর ভোটের শতাংশ বেড়ে 36.8 শতাংশে উন্নীত হয় যখন এটি লাভ করে আসন সংখ্যাও 75-এ উন্নীত হয়। আরসিপিআই, জেএস, হিন্দু মহাসভা নিয়ে গঠিত ফ্রন্ট এবং কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য কোন আসন পায়নি।

কংগ্রেসের অবশ্য 1962 সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি। রায় জনগণের আস্থাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস সংগঠনকে আরও সুসংহত করা হয়েছে। চীনের সাথে ভারতের ক্রমবর্ধমান সীমান্ত উত্তেজনা কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য বামপন্থীদের, যারা দর্শনীয় গণআন্দোলনের (যেমন 1959 সালে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে) কিছু জায়গা অর্জন করেছিল, তাদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে ফেলেছিল। অন্যান্য বিরোধী শক্তি, বিশেষ করে সমাজতন্ত্রীরা, খুব একটা অগ্রগতি করতে পারেনি কারণ তাদের নীতিগুলি কংগ্রেসের মতোই ছিল যারা সমাজের একটি সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ন গ্রহণ করেছিল - 1954 সালে এর লক্ষ্য হিসাবে। আসলে, তাদের উপহাসমূলকভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল কংগ্রেসের 'বি' দল। 1962 সালে বামপন্থী জোট ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট নামে পরিচিত ছিল। প্রজা সমাজবাদীরা এবার জোটের বাইরে থেকে গেল, ফলে বামপন্থী ভোটের শতাংশ কিছুটা কমেছে, যেখানে আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে দাঁড়িয়েছে 63-এ।

1967 সালের নির্বাচন:

1964 সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিজেই সিপিআই এবং সিপিআই(এম) এ বিভক্ত হয়েছিল। B.C এর পর 1962 সালে রায়ের মৃত্যু, পি.সি. সেন তার স্থলাভিষিক্ত হন। পরেরটির ভাবমূর্তি একটি দুষ্ট চরিত্র হত্যা অভিযানের দ্বারা ক্ষুণ্ন হয়েছে যা তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিহিত করেছিল। তা ছাড়া, রায়ের মর্যাদা বা প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁর ছিল না। প্রশাসন 1964 সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে অঙ্কুরে নিশ্চিহ্ন করতে অক্ষমতার সাক্ষী হিসাবে শিথিল হয়ে উঠছিল।

1966 সাল ছিল CPI(M)-এর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এটি খাদ্যের অভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল, যা মার্চ ও এপ্রিলের বন্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল। এটি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারগুলিকে নাড়া দিয়েছিল যারা জনসাধারণকে চাঙ্গা করার জন্য সিপিআই(এম) নেতাদের মুক্তি দিয়েছিল। কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়েছিল ধনী কৃষকদের বিচ্ছিন্নতার কারণে যারা 1965 সালে প্রবর্তিত রেশনিং ব্যবস্থার সাথে খাদ্যশস্য সংগ্রহের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছিল এবং এছাড়াও অজয় মুখার্জি-একজন শ্রদ্ধেয় নেতা যিনি তার মতপার্থক্যের পরে দল ত্যাগ করেছিলেন তার দ্বারা বাংলা কংগ্রেস গঠনের কারণে। অতুল্য ঘোষের সাথে। 1967 সালের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাথে সাথে, কংগ্রেস শুধুমাত্র প্রভাবশালী দল হয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো নির্বাচনে সবচেয়ে বিধ্বংসী ও অপমানজনক পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। অনেকের মাথা ঘুরে গেছে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী পি.সি. সেন এবং দলের শীর্ষ নেতা অতুল্য ঘোষ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে জোটের রাজনীতি:

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে, পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলগুলি নিজেদেরকে দুটি বিস্তৃত শিবিরে বিভক্ত করেছিল- একটিতে সিপিআই(এম) এবং অন্যটি বাংলা কংগ্রেস এবং সিপিআই দ্বারা প্রভাবিত। যেখানে ইউনাইটেড লেফটিস্ট ফ্রন্ট (ইউএলএফ) সাতটি দলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেমন। সিপিএম, আরএসপি, এসএসপি, এসইউসি, ওয়ার্কার্স পার্টি, আরসিপিআই এবং মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক,

পিপলস ইউনাইটেড লেফটস্ট ফ্রন্ট (পিইউএলএফ) এর মধ্যে রয়েছে সিপিআই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বলশেভিক পার্টি। উভয় ফ্রন্টের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল প্রভাবশালী কংগ্রেস পার্টির প্রতি তাদের বিরোধিতা।
1967 সালের নির্বাচনে, কংগ্রেস মোট 280টির মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক আসন-127টি অর্জন করেছিল-কিন্তু এটি সরকার গঠনের অবস্থানে ছিল না। 25 ফেব্রুয়ারী 1967-এ, দুই বামফ্রন্টের নেতারা, যেমন। ULF এবং PULF, বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখোপাধ্যায়কে তাদের নেতা হিসাবে নিয়ে চৌদ্দটি দলগুলির একটি ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) গঠন করে। 1967 সালের 1 মার্চ যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় এবং 14-দফা ন্যূনতম কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কোয়ালিশন মন্ত্রনালয়ের তাৎক্ষণিক জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ছিল দারুণ উৎসাহ ও আশার। কিন্তু পরবর্তীকালে শিল্প ও কৃষি বিরোধ, খাদ্য নীতি এবং তাদের থেকে সৃষ্ট আইনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি মোকাবিলা নিয়ে ঐক্যফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দেয়। বাংলা কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় এবং বাম কমিউনিস্টদের মধ্যে পথ বিচ্ছেদ একপর্যায়ে সম্পূর্ণরূপে দেখা দেয়। দলগুলো সাধারণ কর্মসূচিকে হিমাগারে ফেলে দেয়। কমিউনিস্টরা তাদের নিজস্ব লোকদের মূল পদে বসানোর চেষ্টা করে এবং জোটের ডানপন্থী দলগুলোর নিন্দা করতে শুরু করে। মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে সমালোচনা করা হয়। এস. মুলগাওকার লেখায় হিন্দুস্তান টাইমস তাকে "অনিচ্ছা এবং দুর্বল মানসিকতার একটি করুণ ব্যক্তিত্ব" বলে অভিহিত করেছে।
1968 সালের নভেম্বরে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী পি.সি. ঘোষ আরও সতেরো জন সদস্যসহ যুক্তফ্রন্ট থেকে দলত্যাগ করেন। তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (পিডিএফ) নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। রাজ্যপাল, ধর্মভীরা, অজয় মুখার্জী মন্ত্রক বরখাস্ত করেন এবং ঘোষ নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। এটি একটি PDF-কংগ্রেস জোট ছিল। কোনো কংগ্রেসম্যান সরকারে প্রবেশ করেনি কিন্তু কংগ্রেস পার্টি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। বিধানসভার স্পিকার, বিজয় ব্যানার্জি, 29 নভেম্বর তার রায়ের মাধ্যমে একটি সাংবিধানিক অচলাবস্থা তৈরি করেছিলেন। সংবিধান অনুযায়ী সরকার চলতে পারে না বুঝতে পেরে ধর্মবীর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার সুপারিশ করেছিলেন। বিধানসভাও ভেঙে দেওয়া হয়।
অবশেষে মধ্যবর্তী ভোট 9 ফেব্রুয়ারি 1969 তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করার জন্য 28টি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে 12টি নির্বাচনের আগে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ইউনাইটেড ফ্রন্ট 280 এর হাউসে 218 টি আসন জিতেছিল। বিজয় অর্জনের পরে, ইউএফ-এর গঠনকারী দলগুলি পোর্টফোলিও বন্টন নিয়ে ঝগড়া শুরু করে। নেতা নির্বাচন, মন্ত্রণালয় প্রণয়ন ও দপ্তর বণ্টন সহজ কাজ ছিল না। ফ্রন্টের একক বৃহত্তম অংশীদার হিসাবে, সিপিএম মুখ্যমন্ত্রীত্ব এবং স্বরাষ্ট্র পোর্টফোলিওতে তার দাবি রাখে। অন্যদিকে অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়া মন্ত্রিত্বে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অবশেষে 20 ফেব্রুয়ারী 1969-এ, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অজয় মুখার্জি এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জ্যোতিবসু (সিপিএম) এর মধ্যে স্বরাষ্ট্র পোর্টফোলিও বিভক্ত করার জন্য একটি সমঝোতা পাওয়া যায়। আগেরটি ছিল “হোম (রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা)” এবং পরেরটি “হোম (সংবিধান, নির্বাচন, বিশেষ সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ এবং প্রেস)” দেখাশোনা করত। 30 সদস্যের জোটে দলভিত্তিক মন্ত্রী পদের বণ্টন নিম্নরূপ: বাংলা কংগ্রেস-4, সিপিএম-9, সিপিআই-4, ফরোয়ার্ড ব্লক-3, আরএসপি-2, এসইউসি-2, এলএসএস-1, গোর্খা লীগ- 1, ওয়ার্কার্স পার্টি-1, RCPI-1, ফরোয়ার্ড ব্লক (M)-1, এবং বলশেভিক পার্টি-1।
পশ্চিমবঙ্গের জনগণের চাপের সমস্যা সমাধানে এবং রাজ্যে একটি দক্ষ ও স্থিতিশীল সরকার প্রদানের জন্য তার শক্তি ব্যয় করার পরিবর্তে, যুক্তফ্রন্টের প্রভাবশালী অংশীদার হিসাবে সিপিএম বিশৃঙ্খলা ছড়াতে এবং পরিস্থিতি তৈরি করতে বেশি আগ্রহী বলে মনে হয়েছিল। মন্ত্রনালয় এবং সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে এবং আরও অনেক কিছু। রাজ্যপাল ধরমবীরের প্রত্যাহার ইস্যুতে শীঘ্রই কেন্দ্রের সাথে গুরুতর বিরোধ দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার তাকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছে কারণ "বর্তমান গভর্নর এবং নতুন ইউএফ মন্ত্রকের মধ্যে কোনও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না।" একই সময়ে, রাজ্য মন্ত্রিসভা যৌথ অধিবেশনে তাঁর দ্বারা প্রদত্ত রাজ্যপালের বক্তৃতার খসড়া তৈরি করেছিল যাতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা, ঘোষের পিপলস প্রতিষ্ঠায় রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রের ভূমিকার বিষয়ে অত্যন্ত সমালোচনামূলক উল্লেখ রয়েছে। গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার, এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি।

যুক্তফ্রন্ট জনসাধারণের মনে যে বড় আশা জাগিয়েছিল তা একত্রে টানতে ব্যর্থ হওয়ায় শীঘ্রই ভেঙে যায়। এটা স্বাভাবিক ছিল যে সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে তাদের অবস্থানকে সুসংহত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। সিপিএম মন্ত্রীদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং তাদের আধিপত্যের অবস্থান দেওয়ার জন্য এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য দলগুলিকে দৃশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মন্ত্রকের গঠন এবং পোর্টফোলিওগুলির বন্টন তৈরি করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অজয় মুখোপাধ্যায় নতুন স্কিমের অধীনে জিনিসপত্রের মাথার চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে না। প্রধানত শ্রমনীতি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীদের মধ্যে মতপার্থক্য এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে সেগুলো প্রকাশ্যে প্রচারিত হয় এবং জনসমক্ষে আলোচনা হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় জনগণের জানমাল আর নিরাপদ ছিল না। শিল্প প্রবৃদ্ধি ভার্চুয়াল স্থবির হয়ে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে রাজধানীর একটি সাধারণ ফ্লাইট ছিল। আগস্ট-সেপ্টেম্বর 1969 সালে, সিপিআই এবং সিপিএম-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, দুটি বিশিষ্ট UF অংশীদার, পূর্ববর্তীদের দ্বারা তার কর্মীদের উপর আক্রমণের অভিযোগ এবং UF মিটিং বয়কটের সাথে। 7 নভেম্বর 1969-এ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি ব্যাপক সহিংসতা ও অনাচারের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী সত্যাগ্রহ এবং নাগরিক প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এতদূর গিয়ে বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে কোনও "সভ্য সরকার" নেই। এটি ইতিহাসে অনন্য এবং নজিরবিহীন কিছু ছিল যে একজন মুখ্যমন্ত্রীকে তার নিজের সরকারকে অসভ্য বলা উচিত এবং তার নিজের সরকারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। তিনদিনের অনশনের মধ্য দিয়ে ১ ডিসেম্বর সত্যাগ্রহ শুরু হয়। 20 জানুয়ারী 1970-এ এই সংঘর্ষ আরও "সমালোচনামূলক" হয়ে ওঠে যখন মুখ্যমন্ত্রী সিপিএমের লোকদের দ্বারা লাঞ্ছিত এবং ঘেরাও করা হয়েছিল এবং পুলিশ নীরবে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। জ্যোতিবসু এবং অজয় মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে চিঠিপত্র প্রকাশ করে যে প্রাক্তন পরবর্তীটিকে বস হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং শুধুমাত্র সিপিএমের সৌজন্যে তাকে সরকারের স্টুয়ার্ড হিসাবে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন যা ছিল বৃহত্তম একক ইউএফ অংশীদার। বুঝতে পেরে যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খালাসের বাইরে অবনতি হয়েছে, এবং জোটের কার্যকারিতা আর সম্ভব নয়, মুখার্জি 16 মার্চ 1970 সালে রাজ্যপালের কাছে তার পদত্যাগপত্র জমা দেন। পরের দিন, সিপিএম এর প্রতিবাদে একটি "বন্ধ" ডেকেছিল। পদত্যাগ উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু বিকল্প মন্ত্রক গঠনের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু 165 জন বিধানসভা সদস্য নিয়ে দশটি দল রাজ্যপালকে চিঠি লিখেছিল যে তারা শুধুমাত্র সিপিএম দ্বারা একটি মন্ত্রক গঠনের বিরোধিতা করেছিল। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট করেছিলেন যে রাজ্যে সাংবিধানিক যন্ত্রপাতি ভেঙে পড়েছে এবং রাষ্ট্রপতি 19 মার্চ পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসন ঘোষণা করেছিলেন এবং এর সাথে 13 মাসের পুরানো দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার শেষ হয়েছিল।

উভয় ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকারের পতনে সিপিআই (এম) এর অবদান উল্লেখযোগ্য ছিল এবং প্রধানত এর মূল ভিত্তি প্রসারিত ও শক্তিশালী করার জন্য তাদের ব্যবহার করার প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সহিংসতা অবাধে ব্যবহার করা হয়েছিল, শুধুমাত্র কংগ্রেস এবং নকশালদের বিরুদ্ধে নয়, যুক্তফ্রন্টের নিজস্ব মিত্রদের বিরুদ্ধেও। অতএব, এটি খুব কমই আশ্চর্যজনক ছিল যে পরবর্তী বেশিরভাগই এর বিরুদ্ধে গিয়েছিল।

1971 সালের 10 মার্চ বিধানসভার জন্য নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান প্রতিযোগীরা ছিল সিপিএম, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক (এম), ওয়ার্কার্স পার্টি এবং বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস এবং ইউনাইটেড লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউএলডিএফ) (সিপিআই, সমাজতান্ত্রিক ঐক্যের সমন্বয়ে গঠিত ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট (ইউএলএফ)। কেন্দ্র, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং গুর্খা লীগ)। বাংলা কংগ্রেস, কংগ্রেস® এবং কংগ্রেস (ও) সহ অন্যান্য দলগুলি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করেছিল। কংগ্রেস ® ঘোষণা করেছে যে এটি বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি সরকারে প্রবেশ করবে। এর ভিত্তিতে, ইউনাইটেড বামফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ঐক্য কেন্দ্র, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল এবং ঝাড়খণ্ড পার্টি গঠনকারী দলগুলি ছাড়া বিধানসভার সমস্ত দল একটি "গণতান্ত্রিক জোট" গঠন করে। 2 এপ্রিল 1971 মুখার্জি একটি সরকার গঠন করেন। কিন্তু প্রায় দুই মাস পরে পাঁচজন বাংলা কংগ্রেস বিধায়ক সরকার ত্যাগ করে একটি স্বাধীন দল গঠন করেন। ইতিমধ্যে, বাংলাদেশ সংকট এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আগমন অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তিনি রাজ্যের প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন বুঝতে পেরে, অজয় মুখার্জি রাজ্যপালের কাছে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন। ফলে ১৯৭১ সালের ২৮ জুন রাষ্ট্রপতি শাসন জারি

হয়। 1972 নির্বাচন মিসেস গান্ধীর কংগ্রেস 1972 সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআই-এর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে জয়লাভ করে। সিপিআই (এম) যেটি ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো তার কিছু প্রাক্তন মিত্রদের সমর্থন পুনরুদ্ধার করেছিল, ব্যর্থ হয়েছিল। কংগ্রেস পার্টি 280টির মধ্যে 216টি আসন জিতেছে যেখানে সিপিএম মাত্র 14টি আসন পেয়েছে। প্রাক্তনটির সাফল্য আংশিকভাবে বাংলাদেশের মুক্তির সাথে মোকাবিলায় ভারতের ভূমিকার কারণে ছিল যা মিসেস গান্ধীর জনপ্রিয়তাকে অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের স্থবিরতা, ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার মনস্তত্ত্ব, প্রধানমন্ত্রীর র‍্যাডিকাল কর্মসূচী এবং বাংলাদেশ- সব মিলিয়ে রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে নতুন পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। একদিকে, কংগ্রেস এবং তার গ্রামীণ নির্বাচনী ভিত্তির মধ্যে ফাটল যথেষ্ট পরিমাণে নিরাময় হয়েছিল; এবং অন্যদিকে, বামপন্থীরা ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের সমর্থনের শহুরে কেন্দ্রগুলি থেকে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি অনুভব করে। 1972 সালের রাজ্য নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের পর, এস এস রায় মুখ্যমন্ত্রী হন।

1977 এবং 1980 নির্বাচন

1977 সালের নির্বাচন কংগ্রেসের জন্য বিপর্যয়কর প্রমাণিত হয়েছিল। জনতা-সিপিআই(এম) জোট বেশিরভাগ আসন পেতে সক্ষম হয়েছিল এবং কংগ্রেসকে মাত্র 3টি আসনে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। রাজ্য থেকে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে সিপিআই(এম)। এবং, দেশের জন্য, সামগ্রিকভাবে, জনতা পার্টি যার সাথে জগজীবন রাম-এর নেতৃত্বে CFD পরে একীভূত হয়েছিল, নতুন দিল্লিতে ক্ষমতায় আসে।

সিপিআই(এম) 1977 সালের জুন পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রান্তরে রয়ে গেছে যখন এটি সর্বকালের সবচেয়ে চমকপ্রদ রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী হয়ে মিত্রদের সাথে হাস্টিংসকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে, সিপিআই(এম) 294 সদস্যের বিধানসভায় 35.91 শতাংশ ভোট পেয়ে 178টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। বামফ্রন্টের অংশীদারদের মধ্যে, ফরওয়ার্ড ব্লক 25টি, ফরওয়ার্ড ব্লক (এম) 2, আরএসপি 20, আরসিপিআই 3 এবং বিপলা বাংলা কংগ্রেস- একটি আসন মোট 51টি করে। জনতা এস পার্টি 29টি এবং কংগ্রেস 20টি আসন জিতেছে। .

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে, আসন সমন্বয় নিয়ে জনতা পার্টি এবং বামপন্থীদের মধ্যে আলোচনা ভেস্তে যায়। জনতা পার্টি 90টির বেশি আসন দিতে নারাজ, বামপন্থীরা কমপক্ষে 150টি আসন দাবি করেছিল।

1977 সালের নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভোটারদের অপ্রতিরোধ্য নির্বাচনী বিজয় তখন থেকেই জোউ সবচেয়ে শক্তিশালী সিমেন্টিং ফ্যাক্টর। আরেকটি নির্ধারক ফ্যাক্টর হল সিপিএম-এর জয়লাভ, নিজে থেকে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যা দলটিকে যথেষ্ট সুবিধা দিয়েছে। সিপিএম নেতারা অতীতের তিক্ত শিক্ষাগুলিকেও বিবেচনায় নিয়েছিলেন এবং তখন থেকেই ফ্রন্টের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি একটি "বড় ভাই" মনোভাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করার চেষ্টা করেছিলেন।

1980 সালের লোকসভা নির্বাচন কংগ্রেস (আই) কে প্রায় 37 শতাংশ ভোটারের সমর্থন উপভোগ করার ঐতিহ্যগত অবস্থানে নিয়ে আসে, যেখানে সিপিআই(এম) ভোট 40 শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বামফ্রন্টের মোট ভোট 52 শতাংশের বেশি। ইতিমধ্যে, জনতা পার্টি, যেটি 1977 সালে 20.55 শতাংশ ভোট পেয়েছিল, 1980 সালের লোকসভা ভোটে মাত্র 5 শতাংশে নেমে গিয়েছিল।

সিপিএম-এর নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট সরকার সচেতনভাবে গ্রামীণ এলাকায় কংগ্রেসের (আই) ঐতিহ্যবাহী ক্ষমতার ভিত্তিকে ব্যাহত করতে চেয়েছিল। "অপারেশন বর্গা" -এর মতো ব্যবস্থায় কৃষি শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরি, জমির পুনর্বন্টন এবং

পঞ্চায়েত সংস্থার নির্বাচনের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিকে ব্যাহত করা যা দরিদ্রদের গ্রামীণ ধনী শ্রেণীর সাথে আবদ্ধ করে রাখে, তা সে জমির মালিক, অর্থঋণ বা ব্যবসায়ী হোক না কেন। এই পদক্ষেপগুলি ধনী এমনকি মধ্যম কৃষকদের বিচ্ছিন্ন না করার জন্য সমানভাবে সচেতন প্রচেষ্টার পাশাপাশি এগিয়েছিল; কৃষকদের কাছ থেকে লেভি চাল সংগ্রহে রাজ্য সরকারের অস্বীকৃতি শুধুমাত্র একটি নির্দেশক।"

মে 1982 বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। আদৌ নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। রাজ্য কংগ্রেস (আই) নেতারা, কেন্দ্রের আশীর্বাদে, এক বা অন্য অজুহাতে নির্বাচন স্থগিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং আইন-শৃঙ্খলার খারাপ অবস্থা ছিল তাদের প্রধান অজুহাত যারা ভোটারদের

মুখোমুখি হতে ভয় পেয়েছিলেন। তারা আশা করেছিল যে সিপিএম-এর নেতৃত্বাধীন শিল্প মন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যেতে পারে এবং 356টি নির্বাচন তাদের পক্ষে আরও অনুকূল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে পারে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এসএল-এর সততা ও সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ। শঙ্খধের, কংগ্রেসের (আই) স্বপ্ন পূরণ হতে পারেনি।
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বিজয়ের একটি আকর্ষণীয় দিক হল, ক্ষমতায় থাকাকালীন একটি কমিউনিস্ট সরকার একটি অবাধ নির্বাচনের মুখোমুখি হওয়ার এবং শাসন করার জন্য একটি শক্তিশালী ম্যান্ডেট নিয়ে ফিরে আসার সম্ভবত প্রথম উদাহরণ। এটা যে কোন হিসাব দ্বারা একটি চিত্তাকর্ষক কর্মক্ষমতা. 1977 সালের নির্বাচনে, ফ্রন্ট 230টি আসন পেয়েছিল। এখন স্কোর ছিল 294-এর মধ্যে 238, অন্তত একটি প্রান্তিক বৃদ্ধি নিবন্ধন করে। কিন্তু ফ্রন্ট কিছু কঠিন নকও নিয়েছে। এর কিছু শহুরে দুর্গ হারানো এবং সন্দেহজনক অশোকমিত্র সহ ছয়জন মন্ত্রীর পরাজয় অবশ্যই সিপিআই(এম) নেতাদের নাড়া দিয়েছে। দেশের উপর পার্টির দখলকে শক্তিশালী করার জন্য- এমন একটি কৌশল যা অবশ্যই লভ্যাংশ দিয়েছে- তারা গুরুত্বপূর্ণ মেট্রোপলিটন এলাকায় কিছুটা জায়গা হারিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুৎ সংকট এবং অন্যান্য নগর সমস্যার কারণে এটি সম্পূর্ণরূপে হতে পারে না। ঠাকুরের বইয়ের মতো কিছু আবেগপ্রবণ ইস্যুতে হ্যাম-হ্যান্ডেড পদ্ধতি কলকাতা এবং অন্যত্র অসন্তোষের জন্য অবদান রেখেছিল। কংগ্রেস (আই) আগের বিধানসভায় তার শক্তি 22 থেকে 49-এ উন্নীত হয়েছে। অন্য 7 জন বাম-বিরোধী সদস্যের সাথে, 56-সদস্যের বিরোধী ব্লকটি গম্বুজ-আকৃতির বিধানসভার ষষ্ঠাংশ পূরণ করতে পারে তবে এখনও হতে পারে। মার্কসবাদী বনেটে ক্ষুদ্র কিন্তু তীক্ষ্ণ মৌমাছি। 12

কেন্দ্রের সাথে পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক:
মৌলবাদ প্রথম থেকেই বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। এস সি বোস এবং সি আর দাস গান্ধী ছিলেন না। গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বসুর বিদ্রোহের অসাধারণ প্রতীকী মূল্য ছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পার্টি গ্রামীণ ভিত্তি এবং শহুরে শিল্প অর্থায়নের উপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্মিত হয়েছিল। গ্রামীণ অভিমুখের পাশাপাশি একটি সর্বভারতীয় পার্টির সদস্যপদ থাকার কারণে, রাজ্য কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভঙ্গি গড়ে তোলার কোনও শক্তিশালী প্রবণতা ছিল না। যাইহোক, কমিউনিস্টদের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং চাপ রাজ্য কংগ্রেসকে সতর্ক থাকতে বাধ্য করেছিল এবং এটিকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের ন্যায্য অভিযোগগুলিকে সমর্থন করে। তাছাড়া ব্যক্তিত্ব ড.বি.সি. রায় এবং ক্ষমতার একটি স্বাধীন ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য তার আগ্রহ ছিল গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
ডক্টর বি সি রায়ের আমলে রাজ্যের চাহিদা ছিল ঐতিহ্যগত পরিকল্পনা, শিল্প অবস্থান, অর্থ, খনি এবং খনিজ। তার অভিযোগ সংবিধানের বিরুদ্ধে নয়, যে পদ্ধতিতে সংবিধান কাজ করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে। তিনি পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকার জন্য বিশেষভাবে সমালোচক ছিলেন যা সংবিধান দ্বারা সৃষ্ট স্বাভাবিক ফেডারেল ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করেছিল।
ডক্টর রায়ের আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধারাবাহিক অর্থ কমিশনের সামনে যে স্মারক পেশ করেছিল তা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রকাশক। রায় বুঝতে পেরেছিলেন যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদের ভারসাম্যের অভাবে ভারতীয় ফেডারেশনের রাজনৈতিক ইউনিট হিসাবে রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা যাবে না। তিনি বারবার সম্পদের ভারসাম্যহীনতা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। এমনকি যখন রাজ্যের দাবির মুখে কেন্দ্র কঠোর বলে মনে হয়েছিল, তখনও রায় দেননি। কিংবা তিনি আন্দোলনের পথও নেননি। তিনি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে প্রতিকার চেয়েছিলেন।

একটি প্রাসঙ্গিক কেস হল কয়লা বহনকারী এলাকা (অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন) আইন, 1957-এর সাংবিধানিকতা নিয়ে বিরোধ। রাজ্য সরকার এই আইনের প্রাপ্যতাকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছে, এবং জমিতে এবং জমির উপর জমি ও অধিকার অধিগ্রহণের কেন্দ্রের ক্ষমতা। সংবিধানের 294 অনুচ্ছেদ দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে অর্পিত। কেন্দ্র পরবর্তীকালে রাজ্যের কয়লা খনির প্রকল্পে সম্মত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের অনুভূতি নরম করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাজ্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে কেন্দ্রের এই মনোভাবও রাজ্য সরকারকে আদালতে বিচারাধীন মামলা প্রত্যাহার করতে ব্যর্থ হয়েছিল। B.C. রায় পরিকল্পনা কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং এমনকি পশ্চিমবঙ্গের কিছু প্রকল্পের জন্য সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন। 13 তখন ডক্টর রায়ের

লক্ষ্য ছিল রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের উপর ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীয় আগ্রাসন প্রতিরোধ করা এবং এই অঞ্চলের স্বাধীন শক্তির ভিত্তি রক্ষা করা।

পশ্চিমবঙ্গে, যুক্তফ্রন্ট গঠনের শুরু থেকেই রাজ্যের দাবিগুলি তৈরি করা শুরু হয়েছিল, এবং যত দিন যেতে থাকে, ততই ক্রমবর্ধমান রাজনীতিকরণ এবং মৌলবাদী হয়ে ওঠে। আন্দোলনের উদ্দেশ্যে বাংলার রাজনৈতিক ঐতিহ্যের ব্যবহার সিপিআই(এম) এর লক্ষ্য ও কৌশলের কাঠামোর সাথে চমৎকারভাবে মানানসই। বিশেষ করে 1969 সালে দ্বিতীয় UF-এর সময়, CPI(M) তার প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে সংগঠিত কেন্দ্র-প্রলোভনের জন্য আঞ্চলিক দাবিগুলিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যান্য জোটের অংশীদার যারা তাদের সমর্থন-ভিত্তি এবং নেতৃত্বে বেশিরভাগই আঞ্চলিক ছিল, তাদের মেনে নেওয়া যেতে পারে। যদিও মতাদর্শগতভাবে কেন্দ্রীয়তাবাদী, কমিউনিস্ট মার্কসবাদীরা আঞ্চলিক দাবির গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক কারণ তাদের সমর্থন ভিত্তি প্রধানত আঞ্চলিক, প্রভাবের ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায় সীমাবদ্ধ। তাদের কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক দাবিগুলিকে একত্রিত করার দিকে পরিচালিত হয়। এটা তাদের আদর্শিক অবস্থানের সাথে খাপ খায় যে কেন্দ্র জনগণের শ্রেণীশত্রু।

কেন্দ্রের সাথে পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক সম্পর্কিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের 18-দফা মৌলিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজ্য সরকারের উপর আরোপিত বেশ কয়েকটি সীমাবদ্ধতা এবং কেন্দ্রের উপর তার নির্ভরতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার কারণে, ইউএফ সরকার, রাজ্য সরকারের জন্য আরও ক্ষমতা এবং অধিকার অর্জনের চেষ্টা করবে। তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় যুক্তফ্রন্টের অনুভূতির প্রতিধ্বনি ছিল। জ্যোতিবসু, বিধানসভায় 1967-68-এর জন্য সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করার সময় বলেছিলেন যে রাজ্য সরকার শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তার "অসম বন্টনের" প্রশ্নটি জোরালোভাবে গ্রহণ করবে। বার্ষিক শ্রম মন্ত্রীদের সম্মেলনে, কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রী জে. হাতি ঘেরাওয়ের পদ্ধতিগুলিকে অস্বীকার করেছিলেন৷ রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকদের ঘেরাও করার অধিকারকে স্পষ্টভাবে রক্ষা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রের মধ্যে আরেকটি বিতর্কিত সমস্যা খাদ্য সম্পর্কিত। রাজ্যটি যখন তীব্র খাদ্য ঘাটতির কবলে পড়েছিল, রাজ্যে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য চাপ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে পশ্চিমবঙ্গের ছয়জন মন্ত্রী একটি ধর্না ও অনশনের আয়োজন করেছিলেন। যখন 21 নভেম্বর 1968-এ, রাজ্যপাল মুখার্জি মন্ত্রককে বরখাস্ত করেন, তখন যুক্তফ্রন্ট রাজ্যের প্রথম অ-কংগ্রেস মন্ত্রককে পতনের জন্য কেন্দ্রকে অভিযুক্ত করে। দ্বিতীয় ইউএফ সরকার অবিলম্বে গভর্নর ধরমভিরাকে প্রত্যাহার করার দাবি জানায়। একই সময়ে, রাজ্য মন্ত্রিসভা যৌথ অধিবেশনে তাঁর দ্বারা প্রদত্ত রাজ্যপালের বক্তৃতার খসড়া তৈরি করেছিল, যাতে ইউএফ সরকারকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রের ভূমিকার বিষয়ে অত্যন্ত সমালোচনামূলক উল্লেখ রয়েছে। 24 শে মার্চ কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ (সিআরপি) দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের প্রশাসনিক ভবনে একটি জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে ষাট জন আহত হলে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘর্ষ ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতিবসু সিআরপির পদক্ষেপে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং রাজ্য থেকে সিআরপি ইউনিটগুলি প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ রাজ্য সরকারের এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের সমস্ত অংশে সিআরপি বাহিনী মোতায়েন করার কেন্দ্রের অধিকারকে জোর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে কোনও রাজ্য সরকার তাদের অঞ্চল থেকে তাদের প্রত্যাহারের জন্য বলতে পারে না। 1969 সালের এপ্রিলে কসিপুরে গুলি চালানোর ফলে নয়াদিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। কসিপুর গান এবং শেল কারখানার নিরাপত্তারক্ষীদের দ্বারা শ্রমিকদের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে, যুক্তফ্রন্ট একটি "বাংলা বন্ধের আয়োজন করে। " রাজ্য সরকার বনধে তার সমস্ত সমর্থন দিয়েছে এবং এটি কেন্দ্রকে ক্ষুব্ধ করেছে। যখন কেন্দ্র কসিপুর ফায়ারিং নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল, তখন বসু তার নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পশ্চিমবঙ্গ-নয়াদিল্লি সম্পর্কের আরেকটি সমস্যা আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত। UF অভিযোগ করেছে যে নয়াদিল্লি কলকাতার জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তা কমিয়েছে এবং এটি রাজ্যের বৈধ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেনি। 1978 সালের 18-19 মার্চ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায় কেন্দ্রকে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের কাছে নত হতে হয়েছিল যাতে পরিকল্পনা অর্থায়নের বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদ ভাগাভাগি করার প্রশ্নে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

রাজ্য স্বায়ত্তশাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নথি:
পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্গঠনের দাবি করে আসছে, যার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত নির্ভরতা ও অধস্তনতার বর্তমান অবস্থান থেকে তুলে নেওয়া এবং তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বৃহত্তর অংশ দেওয়া। রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনকে বাস্তব ও কার্যকর করার জন্য, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা 1977 সালের 1 ডিসেম্বর তার সভায় গৃহীত নথিটি এবং অন্যান্য রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভার সদস্যদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত, বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেছে। আইনী, আর্থিক এবং প্রশাসনিক সম্পর্কের সাংবিধানিক সংশোধনী।

নথিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে ।) কেন্দ্রের এখতিয়ার প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় সহ বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রা এবং যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক সমন্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত; ii) অবশিষ্ট এখতিয়ার সহ অন্যান্য সমস্ত বিষয় রাজ্যগুলির একচেটিয়া উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত৷ তদনুসারে, সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলিকে এমনভাবে সংশোধন করা উচিত যে কেন্দ্র কোনওভাবেই রাজ্যগুলির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না; এমনকি রাষ্ট্রীয় বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতিরও প্রয়োজন হবে না; iii) সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স বা অন্য কোন পুলিশ বাহিনী যা কেন্দ্রীয় সরকার বাড়াতে পারে, তাদের রাজ্যে কাজ করার অধিকার থাকবে না; iv) কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির তাদের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব সহ পৃথক প্রশাসনিক পরিষেবা থাকা উচিত; v) রাজ্যসভায় সমস্ত রাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত, 370 অনুচ্ছেদে নির্ধারিত কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বজায় রাখা উচিত, সমস্ত নাগরিকের তাদের মাতৃভাষায় সমস্ত স্তরে প্রশাসনের সাথে চিঠিপত্রের অধিকার থাকা উচিত; এবং vi) অর্থ কমিশন এবং রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত নিবন্ধগুলিকে সংশোধন করতে হবে যাতে অর্থ কমিশনের দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যে বরাদ্দের জন্য সমস্ত উত্স থেকে কেন্দ্রের মোট রাজস্বের 75 শতাংশ প্রদান করা হয়। কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা রাজস্বের অনুপাত নির্ধারণ করা অর্থ কমিশনের কাজ হওয়া উচিত নয়। এর কাজটি কেবলমাত্র প্রতিটি রাজ্যকে কেন্দ্রের দ্বারা মোট আর্থিক আদায় থেকে যে অনুপাত পাওয়া উচিত তা ঠিক করা উচিত, যার 75 শতাংশ রাজ্যগুলিকে বরাদ্দ করতে হবে। রাজ্যগুলিকে তাদের নিজেদের উপর কর আরোপের জন্য আরও ক্ষমতা দিতে হবে এবং 302 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ এবং হস্তক্ষেপ করার কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধিকার মুছে ফেলা উচিত।
পশ্চিমবঙ্গের নথিটি উগ্র মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের দ্বারা খসড়া করা হয়েছিল, যারা বিশ্বাস করে যে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতভাবে সম্পদের জন্য কেন্দ্রের উপর রাজ্যগুলির নিদারুণ নির্ভরতার নিরাসক্ত প্রভাবকে সরিয়ে দেবে, কার্যকলাপের প্রাথমিক স্ফুরণের জন্ম দেবে, নতুন ধারণা এবং নতুন পরিকল্পনাকে উত্সাহিত করবে, এবং জনপ্রিয় উত্সাহ এবং প্রত্যাশা বৃদ্ধি.
শহুরে-গ্রামীণ রাজনৈতিক সমর্থন-ভিত্তি

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রবণতাগুলির একটি অধ্যয়ন দেখাবে যে যখন কমিউনিস্টদের প্রধান নির্বাচনী সমর্থন শহর এলাকা থেকে টানা হয়েছিল, কংগ্রেসের শক্তির ঘাটি ছিল গ্রামীণ বাংলা। 1957 সালে, উদাহরণস্বরূপ, গ্রামীণ এলাকাগুলি কংগ্রেসকে বিধানসভায় তার 152টি আসনের প্রায় 75 শতাংশ দিয়েছিল, যেখানে সিপিআই তার 46টি আসনের 75 শতাংশ তুলনামূলকভাবে শহরাঞ্চল থেকে পেয়েছিল৷ সারণি 52 1952 থেকে 1971 সালের মধ্যে শহরাঞ্চলে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের আপেক্ষিক শক্তি দেখায়।

যাইহোক, 1972 এবং 1977 সালের নির্বাচনে, সামগ্রিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়। 1972 সালে, কলকাতার সমস্ত আসন এবং চব্বিশ পরগনার 42টি আসনের মধ্যে 36টি কংগ্রেসের দখলে ছিল, কিন্তু 1977 সালে এই প্রবণতার বিপরীত ঘটনা ঘটেছিল। 1977 সালের নির্বাচনে, সিপিআই(এম)-এর আধিপত্য বামফ্রন্ট কলকাতা ও চব্বিশ পরগণায় যথাক্রমে 22টি আসনের মধ্যে 17টি এবং 55টি আসনের মধ্যে 50টি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের দ্বারা প্রাপ্ত শহুরে নির্বাচনী সমর্থনের আকার এবং কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক আন্দোলনের মাত্রার মধ্যে একটি মোটামুটি সহ-সম্পর্ক দেখা যায়। একটি উচ্চ মাত্রার আঞ্চলিক সংহতি সাধারণত বামপন্থীদের দ্বারা উপভোগ করা শহুরে নির্বাচনী সমর্থনের একটি বড় পরিমাণের সাথে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের বাম আন্দোলন শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

মেজাজ এবং অনুভূতি, তার ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি, এর আহত গর্ববোধকে প্রতিফলিত করতে এসেছিল।14

1982 সালের বিধানসভা নির্বাচনের তথ্য কিছুটা ভিন্ন প্রবণতা প্রকাশ করে। কলকাতা শহরের 22টি আসনের মধ্যে 11টিতে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা কংগ্রেস (আই) এর কাছে পরাজিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ভোটের উচ্চবিন্দু ছিল মার্কসবাদী-অশোকমিত্র, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী ভট্টাচার্য এবং শিক্ষামন্ত্রী পার্থদেয়ের তিন আদর্শ আদর্শের পরাজয়। তিনজন ব্যক্তি তাদের নিজস্ব উপায়ে ফ্রন্ট সরকারের নীতির উপর স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন, বিশেষ করে যারা শহুরে এবং আধা-শহুরে মধ্যবিত্তকে প্রভাবিত করে। সারণি 52

রাজনৈতিক নেতৃত্ব:

পশ্চিমবঙ্গ স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ডব্লিউ.সি.-এর মতো রাজনৈতিক নেতা তৈরি করেছে। জাতীয় আন্দোলনের যুগে বনার্জী, আনন্দ মোহন বসু, বিপিন চন্দ্র পাল, সি আর দাস, সুভাষ চন্দ্র বসু এবং অরবিন্দ ঘোষ। W.C. বনার্জী ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। বিপিন চন্দ্র পাল এবং অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন চরমপন্থী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। সি আর দাস এবং সুভাষ বসু গান্ধীর আবির্ভাবের পর থেকে প্রায় দুই দশক ধরে বাংলার রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বসুর বিদ্রোহ

অসাধারণ প্রতীকী মূল্য ছিল। বসুর জাপান যাত্রা এবং ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন ছিল বাঙালি বীরত্বের এক অভূতপূর্ব উদাহরণ। ডঃ বি.সি. রায়, পি.সি. সেন, এস এস রায়, অতুল্য ঘোষ, জ্যোতিবসু, প্রমোদ দাস গুপ্ত এবং অজয় মুখার্জি প্রমুখ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার নেতা। B.C. রায়ের নেতৃত্ব জনগণের আস্থাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। P.C. সেনের অবশ্য তার পূর্বসূরির মর্যাদা বা প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না। অতুল্য ঘোষ সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেস পার্টিতে তার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রচুর সম্মান অর্জন করেছেন। ঘোষকে তার নিজস্ব লাইনে রাজ্য কংগ্রেস সংগঠিত করার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সাধারণত ড. রায়ের সমর্থনে। অজয় মুখোপাধ্যায় জোটবদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় সবচেয়ে দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী প্রমাণিত। কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হওয়ার পর যখন সিপিআই(এম) একটি পৃথক দল হিসাবে আবির্ভূত হয়, তখন জ্যোতিবসুর সিপিএম-এ যোগদানের সিদ্ধান্ত ছিল যা এই বিষয়টিকে ক্লিন করে এবং নিশ্চিত করেছিল যে রাজ্যের কমিউনিস্ট ক্যাডারদের সিংহভাগ সিপিআই(এম) ভাঁজে চলে গেছে। . বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাস গুপ্ত পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম) এর শক্তিশালী ব্যক্তি। সংগঠনের মানুষ হিসেবে তিনি তার দক্ষতা প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছেন। এই সত্যটি তার ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও, তাকে রাজ্যে দলের নেতা হিসাবে চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বিশ্বনাথ মুখার্জি 1930 এবং 1940 এর দশকের প্রথম দিকে বাংলার ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত সিপিআই-এর শীর্ষস্থানীয় নেতা। এস এস রায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, অজিতপাঞ্জা, গনি খান চৌধুরী এবং অশোক সেন কংগ্রেস পদমর্যাদার বর্তমান নেতা। পশ্চিমবঙ্গে, কংগ্রেসের (1) সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যে জ্যোতিবসু, 15-এর ক্যারিশমার সাথে মেলে এমন কোন নেতা নেই।